অলঙ্কার-অন্বেষা

নরেন বিশ্বাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা ঃ অলঙ্কার-অন্বেষা

স্নেহাস্পদ শ্রীমান নরেন বিশ্বাস রচিত 'অলঙ্কার-অন্বেষা' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। আমার এই আনন্দের বিশেষ কারণ, বাংলাদেশের সম্পত্তিরূপে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক পাইয়া এই বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে আপাততঃ বিদেশী পুস্তকের প্রত্যাশায় থাকিতে হইবে না।

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনে লেখকের উচ্চাঙ্গের গবেষণা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণের মতে বাল্মীকি আদি কবি, রামায়ণ তাঁহার আদি কাব্য। কিন্তু সেখানেও উপমার বৈশিষ্ট্যে অলঙ্কারের প্রাধান্য দেখা যায়, যথা বাল্মীকির কবিত্বলাভ প্রসঙ্গে—

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা॥

রমণীয়তার সৎলোকের প্রসন্নমনের সহিত স্বচ্ছ জলের এই তুলনা কত জ্ঞানগর্ভ—কত ভাবাবহ—কত চমৎকার!

জগতের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে তাহা ঋগ্‌বেদের। অক্ষসূক্তে এক জুয়াড়ী সর্বস্ব হারাইয়া অনুতাপ করিতে করিতে বলিয়াছে—

যদাদীধ্যে ন দ্ বিষাণ্যে ভিঃ
পরায়দভ্যোহ্ বহীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ
এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব।

—অর্থাৎ, আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশা খেলা করিব না, তখন খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গল মূর্তিতে ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টা নারী উপপতির নিকট গমন করে, আমিও সেইরূপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন

করি। সর্বহারা অনুতপ্ত দ্যূতক্রীড়কের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিবার এইরূপ তাৎপর্যপূর্ণ চমৎকার উপমা বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের মতে অথর্ববেদে সে সকল প্রেমের উপাখ্যান ও বশীকরণ মন্ত্রাদি সংকলিত হইয়াছে সে সকল মানব সমাজের আদিম অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া নিঃসন্দেহে ঋগ্‌বেদের বিষয়বস্তু অপেক্ষাও প্রাচীনতর। এই সকল প্রাচীনতম কাব্যেও রচনার উৎকর্ষসাধন ও বাচ্যার্থকে বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার ধারার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এইরূপ উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আদিম কাল হইতেই ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার প্রবৃত্তি সকল যুগের সকল কবি-সাহিত্যিকগণের সহজাত। আর তাহা হইবে না কেন? সালঙ্কারা না হইলে কন্যা সম্প্রদান হয় না। বস্ত্রাভরণহীন কন্যা কাহাকেও আকৃষ্ট করিতে পারে না। 'অলম্' শব্দ সামর্থ্যবাচক। যাহা সুন্দর, মধুর বা সুষম করিতে সমর্থ করে তাহাই অলঙ্কার। রসাত্মম বাক্যই যদি কাব্য হয়, তবে রসই কাব্যের আত্মা এবং অলঙ্কার তাহার পরিপূরক শরীর। শরীরের মধ্যে শরীর দ্বারাই তো আত্মার অনুভূতি।

ব্যাকরণ যেমন ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অলঙ্কার শাস্ত্রও সৌন্দর্যানুভূতির দিক দিয়া তাহাই। ব্যাকরণ যেমন ভাষার পূর্বসত্তার প্রমাণ, অলঙ্কার শাস্ত্রও তেমনি। অতএব অলঙ্কার বিষয়ক প্রাচীনতম পুস্তক হইতেও ভাষায় অলঙ্কারের প্রয়োগ প্রাচীনতর। আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে মহামুনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রই অলঙ্কার বিষয়ে প্রাচীনতম প্রামাণ্যগ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের বাদানুবাদ ও ক্রমবিবর্তন আলোচ্য পুস্তকে লেখক কর্তৃক বেশ নিপুণতার সহিত ধারাবাহিক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিক্রমোর্বশীয় নাটকে কালিদাস ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের মধ্যে নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল বলিয়া পণ্ডিতগণ মোটামুটি একমত হইয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের বালমনোরমা নামক টীকায় ভরতের পূর্বে নন্দিকেশ্বর ও নারদ অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহাদের কোন পুস্তক আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্তী আলঙ্কারিক-গণ প্রধানতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে দশটি গুণ, রূপক, উপমা, দীপক, গমন, চারটি অলংকার ও কাব্যের দোষের উপর ভরত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকারদের মধ্যে হর্ষ, মাতৃগুপ্ত, উদ্‌ভট, রুদ্রভট্ট, ভোজ, লোল্লট, শংকুক, শারদাতনয় ও তরুণ

বাচস্পতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্যের উৎকর্ষ সাধনের উপায় এবং ইহাকে সুষমা-মণ্ডিত করিবার উপাদান আবিষ্কার করিবার জন্য চিন্তা করিতে করিতে কবি ও সাহিত্যকগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহা হইতেই অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতগুলির মধ্যে শব্দালঙ্কার, রীতি, রস ও ধ্বনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়গুলিতে আলঙ্কারিকগণ বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তরের উল্লেখযোগ্য মত হইতেছে বক্রোক্তি, গুণ, অনুমান ও ওচিত্য।

জটিল সংজ্ঞা পরিভাষায় সমাকীর্ণ এবং কঠিন সংস্কৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ উলেখ-যোগ্য অলংকারের গ্রন্থাবলী হইতেছে—ভামহের **কাব্যালঙ্কার** ও **কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি**, উদ্ভটের **অলঙ্কার সংগ্রহ** ও **ভামহালঙ্কার বিবরণ**, রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বামনের **কাব্যালঙ্কার সূত্র**, অভিনবগুপ্তের **অভিনব-ভারতী**, মম্মটের **কাব্যপ্রকাশ**, ভট্টনায়কের **হৃদয়দর্পণ, দশরূপক, রসগঙ্গাধর**, আনন্দবর্ধনের **ধ্বন্যালোক**, অভিনব গুপ্তের **ধ্বন্যালোকলোচন** ও **কাব্যকৌতুকবিবরণ**, ভট্টতৌতের কাব্যকৌতুক, কুন্তকের **বক্রোক্তিজীবিত**, মহিমভট্টের **ব্যক্তিবিবেক**, বিশ্বনাথ কবিরাজের **সাতিহ্য-দর্পণ**, রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের **নাট্যদর্পণ** এবং পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুরের **অলঙ্কারকৌস্তভ**। রাষ্ট্রনীতিতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ হিসাবে পৌরাণিক যুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ নামক যে চারটি উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল বর্তমান যুগে রাজনীতির আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও কোন রাজ্য বা রাষ্ট্র অধিকতর কার্যকর পঞ্চম কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সেইরূপ উপরে উল্লিখিত অলঙ্কার বিষয়ক প্রাচীনগ্রন্থাবলীতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সে গুলির পুনরাবৃত্তি বা চর্বিত-চর্বন-ব্যতীত বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ মৌলিক কোন তত্ত্ব কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এই গ্রন্থের অলঙ্কার ঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ অধ্যায়ে আমাদের জ্ঞাত প্রায় সমস্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থকার অলঙ্কার শাস্ত্রের খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণ রূপরেখা অঙ্কন করিয়াছে। লেখক বয়সে নবীন হইয়াও সমগ্র অধ্যায়-ব্যাপী যে প্রবীণ প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আমি সাতিশয় আনন্দ ও গর্ববোধ করিতেছি।

'অলঙ্কার-অন্বেষার' দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'শব্দালঙ্কার' ও তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থালঙ্কারের অপূর্ব আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে। বাংলা-কাব্যের প্রাচীন যুগ হইতে অত্যাধুনিক যুগের শতাধিক কবির কবিতা বিভিন্ন অলঙ্কারের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং প্রায় সর্বত্রই বিশ্লেষণের সাহায্যে গ্রন্থকার তাহার কাব্য-সৌন্দর্য্য বিচারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধির স্বাক্ষর রাখিয়াছে। বাঙলাদেশে কবি ও কাব্যের অভাব নাই, কিন্তু বিগত দুই

যুগের মধ্যেও কাব্য সৌন্দর্য-বিচারের এই ধরণের একটা গ্রন্থও আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই, সেই দিক দিয়া বিচার করিলে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস রচিত এই গ্রন্থ প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বাঙালী-পাঠক সাধারণের নিকটে সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। 'অলঙ্কার-অন্বেষা' এই দেশের অলঙ্কার চর্চ্চার ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হইবে।

এই গ্রন্থে সঙ্কর-অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচিত হয় নাই, আগামীতে লেখক এই অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি দান করিলে, আমার বিশ্বাস তাহার প্রচেষ্টা আরও সার্থকতর হইবে। সমগ্র পাণ্ডুলিপি পড়িয়া, আমি অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি ও তাহার গভীর সাধনা সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী হইয়াছি। প্রত্যেকটি অলঙ্কারের উদাহরণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে, পাণ্ডিত্য ও সহৃদয় সংবেদনার স্বাক্ষর উজ্জ্বল। যে কোন কাব্য-পাঠক কিংবা অলঙ্কারের ছাত্র ছাত্রী অথবা পণ্ডিতজন কেহই এই পুস্তকের মনোহর আবেদন হইতে বঞ্চিত হইবেন না বলিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি। যাহা হউক অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু দুরূহ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম-বিচার বিশ্লেষণ, প্রাঞ্জল অনুবাদ ও সমন্বয় সাধনরূপ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আলোচ্য পুস্তকে লেখক অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহার জন্য আমি তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইয়া এইখানেই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

ইতি—

রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর
এম. এ. (সপ্ততীর্থ)

চেয়ারম্যান, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২
তারিখ ঃ ৩০.৬.৭৬

বিষয়-ক্রম

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	১৭-৩৮
অলঙ্কার ঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ।	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	৩৯-৫৪
অলঙ্কার ঃ ৩৯-৪০	
শব্দালঙ্কার ঃ অনুপ্রাস; অন্ত্যানুপ্রাস; বৃত্তনুপ্রাস; ছেকানুপ্রাস; শ্রুত্যনুপ্রাস; আদ্যানুপ্রাস—৪০-৪৭;	
যমক ঃ আদ্যযমক; মধ্যযমক; অন্ত্যযমক; সর্বযমক—৪৭-৪৯;	
শ্লেষ ঃ সভঙ্গশ্লেষ; অভঙ্গশ্লেষ—৪৯-৫১;	
বক্রোক্তি ঃ শ্লেষ বক্রোক্তি; কাকুবক্রোক্তি; পুনরুক্তবদাভাস—৫১-৫৪।	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	৫৫-১২০
অর্থালঙ্কার—৫৫-৫৬;	
(ক) সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার—৫৭-৫৮;	
উপমা ঃ পূর্ণোপমা; লুপ্তোপমা; মালোপমা; বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা; বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা; স্মরণোপমা—৫৮-৬৬;	
উৎপ্রেক্ষা ঃ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা; প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—৬৬-৬৯;	
রূপক ঃ নিরঙ্গরূপক; কেবলরূপক; মালারূপক; সাঙ্গরূপক; সমস্ত বস্তুবিষয়ক রূপক; একদেশ বিবর্তি সাঙ্গরূপক; পরম্পরিতরূপক; অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক—৬৯-৭৩; অপহ্নুতি ৭৪-৭৫; সন্দেহ ৭৫-৭৬; নিশ্চয় ৭৬-৭৭; ভ্রান্তিমান ৭৭-৭৮; ব্যতিরেক ৭৮-৭৯; প্রতীপ ৭৯-৮০; সমাসোক্তি ৮০-৮২; অতিশয়োক্তি ৮২-৮৫; দীপক ৮৬; উল্লেখ ৮৭; তুল্যযোগিতা ৮৭-৮৮; প্রতিবস্তূপমা ৮৮-৮৯; দৃষ্টান্ত ৮৯-৯০; নিদর্শনা ৯০-৯১; সামান্য ৯১-৯২; সহোক্তি ৯২; অর্থ শ্লেষ ৯২-৯৩; অনন্বয় ৯৩।	

বিষয় পৃষ্ঠা

(খ) বিরোধমূলক অলঙ্কার ঃ বিরোধাভাস (বিরোধ) ৯৪-৯৬; বিভাবনা ৯৬-৯৭; বিশেষোক্তি ৯৭-৯৮; বিষম ৯৮-৯৯; অসঙ্গতি ৯৯-১০০; অধিক ১০০-১০১; অন্যোন্য ১০১; অনুকূল ১০১।

(গ) শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার ঃ কারণমালা ১০২; একাবলী ১০২-১০৩; সার ১০৩।

(ঘ) ন্যায়মূলক অলঙ্কার ঃ অর্থাপত্তি— ১০৪-১০৫; কাব্যলিঙ্গ বা হেতু ১০৫-১০৬; অনুমান ১০৭; পুরাবৃত্তি বা বিনিময় ১০৭-১০৮; পর্যায় ১০৮-১০৯; সমুচ্চয় ১০৯-১১০।

(ঙ) গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কার ঃ অর্থান্তরন্যাস ১১০-১১২; অপ্রস্তুত প্রশংসা ১১৩-১১৫; আক্ষেপ ১১৬-১১৭; ব্যাজস্তুতি ১১৭; পর্যায়োক্ত ১১৮; ভাবিক ১১৮-১১৯; স্বভাবোক্তি ১১৯-১২০; সূক্ষ্ম ১২০।

প্রথম অধ্যায়

অলঙ্কার ঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ

অলঙ্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ [অলম্-কৃ (করা) + ঘঞ্ ণ।] আভরণ, ভূষণ অর্থাৎ যা দিয়ে শরীরকে সজ্জিত বা ভূষিত করা যায়। সুতরাং নিরাভরণ দেহকে যেমন হার, দুল, বলয়, কাঁকন ইত্যাদি আভরণে মনের মতো সাজানো যায়, তেমনি কাব্য-শরীরকেও কবিগণ উপমা, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিত করেন। বৈদিক 'ঋঞ্জ্' ধাতুর অর্থ অলঙ্করণ ("ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা"—যাস্কমুনি)। পরবর্তীকালে রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্ত্রকে ব'লেছেন সপ্তম বেদাঙ্গ। এবং এ বিষয়ের সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়া বেদার্থেরও সম্যক্ জ্ঞান হয় না। ("উপকারকত্বাদ্ অলঙ্কারঃ সপ্তমম্ অঙ্গম্ যাযাবরীয়। ঋতে চ তৎস্বরূপ-পরিজ্ঞানাদ্ বেদার্থানবগতিঃ।"—কাব্যমীমাংসা, ২-অধ্যায়, পৃঃ ৩) নারী-দেহকেই হোক কিংবা কাব্যশরীরকেই হোক অলঙ্কৃত করার পেছনে রয়েছে মানুষের অনির্বাণ সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অলঙ্কার তার রূপকামী চিত্তেরই প্রকাশ। এ জন্যেই সেই আরণ্যক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র এর অব্যাহত জয়যাত্রা। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যখন গুহাবাসী তখন তার পাথরের ঘরকে কঠিন শ্রমে ছবি এঁকে মনের মতো ক'রে গড়ে তুলতো—ঘরণীকে বনের ফুলে গাছের বাকলে মনোরম করার প্রয়াস ছিল তার সহজাত। মুখের ভাষাকেও সুন্দর করার চেষ্টা তার সেদিন থেকেই।

যুগ বদলেছে, গুহাবাসী মানুষ আজ নগরবাসী কিংবা গ্রামলোকালয়ের বাসিন্দা। নিরন্তর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সে এ যুগের সভ্য নাগরিক। হাজার বছর আগের মানুষের সাথে ব্যবধান তার দুস্তর। রীতি-নীতি, চাল-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে ভাষার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগের মানুষ। এ যুগে আনন্দযন্ত্রণার স্বাদ বদলেছে, বোমার আঘাতে বিশ্বাসের বেলাভূমি বিনষ্টপ্রায়, তবু মানুষ ঘরকে সাজায়, ঘরণীকে মনের মতো অলঙ্কার পরায়। শিল্পসৃষ্টিতে সে অক্লান্ত, কবিতা-নির্মাণে নিবেদিত। বস্তুত অনুরাগী মানুষ 'ক্ষুধার লাগি খাদ্য' এবং তারপর সে কুসুম-ক্রেতা। এ ফুল-তৃষ্ণা বা অনির্বাণ সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা তাকে তাড়িত করে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। অরণ্যচারী নারী একদিন যেমন তনুশোভা নির্মাণে গাছের ছাল, বনের ফুল ধারণ ক'রে নিজেকে অপরূপা

ক'রে তুলেছিলো—আজকের বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিহিতা আধুনিকা নারীও সোনার দুল-হারে নিজেকে মনোরমা ক'রে তোলে। বস্তুত সেদিনের বনফুলে আর আজকের সোনার দুলে বস্তুগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, এ দু'বস্তু ধারণের নেপথ্যে একই চেতনার তাগিদ। তেমনি প্রাচীন যুগের কাব্য-সাহিত্যের অলঙ্কারের সাথে এ যুগের কাব্যশিল্পের অলঙ্কারের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সৌন্দর্য-চেতনা বিকাশের বাসনায় তারা অভিন্ন।

হার, দুল, বলয় নারীদেহে ধারণে অলঙ্কার হয় সত্যি, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এ সবের সহযোগে আরো সুন্দর হওয়া ; তেমনি অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলঙ্কারবস্তু কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে অলঙ্কার মানে সৌন্দর্য। এবং "অলঙ্কারশাস্ত্র-এর প্রকৃত অর্থ সৌন্দর্য-শাস্ত্র বা কাব্য সৌন্দর্যবিজ্ঞান, ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে Aesthetic of poetry" (কাব্যালোক, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ৫৯৩)।

এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে, অলঙ্কার মানে যদি হয় সৌন্দর্যশাস্ত্র, তবে তার জন্যে এত কড়া নিয়মের বাঁধন কেন, অবাধ মুক্তাঙ্গনে এর বিচরণ নয় কেন? উত্তরে এ কথাটাই বলা যায়—যে-কোন সুন্দর পরিমিতি মানতে বাধ্য। এবং অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা সবসময়ই সৌন্দর্য-বিরোধী। অঙ্গুরীয়কে কেউ নাকের নোলক হিসেবে কিংবা অঙ্গদ (বাহুভূষণ)-কে কেউ পায়ের মল হিসেবে ব্যবহার ক'রতে রাজী হবে না—কারণ অনিয়ম; যুগপৎ সৌন্দর্যহানি। তেমনি কাব্যেও যথেচ্ছ অলঙ্কার চাপিয়ে দিলেই হয় না, বিচার ক'রতে হবে সেটা রীতিমাফিক কিনা, প্রয়োগসিদ্ধ কিনা। প্রয়োগের সিদ্ধরীতি নির্দেশই অলঙ্কারশাস্ত্রের আসল কাজ। তবে সাহিত্যে অলঙ্কার শরীরের অলঙ্কারের মতোই বাইরের বস্তু, পণ্ডিতদের ভাষায় 'কাব্যের অনিত্য বা অস্থিরধর্ম।' যুগে যুগে কবি-শিল্পীরা এই অলঙ্কারের উদ্ভাবক এবং সৃষ্টি-শরীরে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগীও বটে।

কবে থেকে কেমন ক'রে অলঙ্কারশাস্ত্রের সূচনা ও বিকাশ সে-ইতিহাস সঠিকভাবে নির্ণয়ের কোন পথ নেই, কারণ প্রাথমিক প্রচেষ্টার সে-অধ্যায়গুলো অদ্যাবধি রহস্যাবৃত, প্রামাণ্য কোন দলিল আমাদের অনায়ত্ত। তবে পণ্ডিতগণের অনুমান আবিষ্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রগুলোর (ভারতীয়) মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থখানির রচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দী। একনিষ্ঠ গবেষণায় হয়তো আরো কিছু তথ্য আবিষ্কার সুকঠিন নয়, তবে ঐ অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে অলঙ্কারশাস্ত্রের উৎস এবং ক্রমবিকাশের রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা হ'য়েছে মাত্র।

'বেদ' উপনিষদাদি ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে নয়—অলঙ্কার ও উপমা শব্দ দুটির সাথে সে যুগের কবি বা ঋষিদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না; যখন দেখি ঋগ্বেদের ঋষি বায়ুদেবতাকে আহ্বান জানিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করেন ঃ

"বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ"—অর্থাৎ হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেবতা, তুমি এসো, তোমার জন্যে এই সোমরস অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছি। যাস্কমুনি 'অরংকার'-কেই অলঙ্কার ব'লেছেন। এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও 'র'-এর স্থানে 'ল'-এর ব্যবহার (উল্লেখ্য, মাগধী প্রাকৃত) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বৈদিক এই 'অরংকার'-ই যে পরবর্তীকালে সংস্কৃতে এবং অন্যান্য ভাষাসমূহে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং ঋগ্‌বেদীয় কৌষীতকি উপনিষদেও আমরা দেখি যখন ব্রহ্মবিদ্ বিজরা নদী পার হয়ে ব্রহ্মলোকে এসেছেন, তখন ব্রহ্মা বুদ্ধিরূপা অপ্সরাদের ব'ললেন, এঁকে আমার যোগ্য সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে আনো—"তং পঞ্চশতানি অপ্সরসাং প্রতিযন্তি শতং চূর্ণহস্তাঃ, শতং বাসোহস্তাঃ, শতং ফলহস্তাঃ, শতম্ আঞ্জনহস্তাঃ, শতং মাল্যহস্তাঃ তং ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলঙ্কুর্ব্বন্তি। স ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলঙ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি"। অর্থাৎ পাঁচশ অপ্সরা কুঙ্কুমচূর্ণ, শত বসন, ফল, অঞ্জন, পুষ্পমাল্য হাতে গেলেন—তাঁকে তাঁরা ক'রলেন ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত, ব্রহ্মবিদ (ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হ'য়ে) চললেন ব্রহ্মাভিমুখে।

প্রাচীন ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল না যে, অপ্সরাদের হাতে যা ছিল কেবল পুষ্পমালা, বসন, ফল, অঞ্জন, ব্রহ্মবিদকে আশ্রয় ক'রে তাই অনায়াসে অলঙ্কার হ'য়ে উঠলো। যেমন হার, দুল, কাঁকনচুড়ির অলঙ্কারত্ব আপেক্ষিক, শিল্পই তার স্বাভাবিক পরিচয়। 'স্বকীয় রূপগত সৌন্দর্যে সে শিল্প, পরের সৌন্দর্যবিধানে সে অলঙ্কার'।

যজুর্বেদীয় কান্বশাখায় শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশকাণ্ডে বা বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩/৯/২৮) যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গাছের সাথে পুরুষের সাদৃশ্য দেখাতে ব'লেছেন ঃ "যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষঃ তস্য লোমানি পর্ণানি, ত্বক্ অস্য উৎপাটিকা বহিঃ, ত্বচঃ রুধিরো রসো বৃক্ষাৎ ইব, অস্থীনি অন্তরতঃ দারুণি মজ্জা মজ্জোপমা"—অর্থাৎ বনস্পতি পুরুষের মতো (পুরুষের) লোমরাজি পাতা, চামড়া বল্কল, এবং রক্ত গাছের রসের মতো, তার হাড় কাঠের মতো এবং বৃক্ষের মজ্জা পুরুষের মজ্জার উপমা। 'অলঙ্কার,' 'উপমা' শব্দের প্রয়োগ কেবল বেদ-উপনিষদে নয়, কবি বাল্মীকির রামায়ণে, ব্যাসের মহাভারতে এবং প্রাচীন খ্যাতিমান কবিদের বিভিন্ন সৃষ্টিতেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

মহাকবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আকাশপথে রাবণের অঙ্কগতা সুনয়না সীতার বর্ণনা প্রসঙ্গে "শুক্লৈঃ সুবিমলৈর্দন্তৈঃ প্রভাভিরলঙ্কৃতম্"। (৫২)। অর্থাৎ (সীতার মুখ) শুভ্র সুনির্মল আলোকিত বা প্রভাময় দন্তরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত। বালকাণ্ডে "অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা" (৩৪) অর্থাৎ ক্ষমাই রমণীকুলের অলঙ্কার। উপমার উৎকৃষ্ট উদাহরণ অরণ্যকাণ্ডে—প্রিয়দর্শনা পম্পার নির্মল জল—"স্ফটিকোপমতোয়াং স তাং দৃষ্টা" অর্থাৎ যে জলের উপমা স্ফটিক তিনি (রাম) তাকে দেখে। (৭৫)

মহাভারতেও এ-জাতীয় প্রয়োগ অর্জুনের বীরত্ব বর্ণনায়, দ্রৌপদীর রূপ চিত্রণে এবং

যুধিষ্ঠিরের গুণ প্রকাশের মধ্যে ব্যাস নিপুণভাবে ব্যবহার ক'রেছেন,—আর তাছাড়া বৃকোদর কুম্ভকর্ণ শূর্পণখা প্রভৃতি নামকরণের মধ্যেও উপমা নিহিত।

একালের রবীন্দ্রনাথের মতো সেকালের কবি-ঋষিরাও অনুভব ক'রতেন ঃ

"…. কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়।…. যা অত্যন্ত অনুভব করি, সে যে অবহেলার জিনিস নয়, এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।" অতএব অলঙ্করণ মানে যে কারুকাজে সুন্দর করা এটা তাঁরা বুঝতেন। তবু এ কথা সত্যি, আর্যযুগে ছন্দশাস্ত্রের মতো অলঙ্কার পৃথক শাস্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। তাই তাঁদের কাব্য অলঙ্করণের প্রধানতম পথ ছিল এই উপমা; স্বীকার্য, পরবর্তীকালের অলঙ্কারশাস্ত্রের বীজ হয়তো ওই আর্যযুগের উপমার মাঝেই উপ্ত হ'য়েছিল।

বৈদিক যুগের পরেও ভারতীয় কাব্য-ভাবনায় উপমার উজ্জল প্রভাব এতটুকু ম্লান হয়নি। উপমার কাজ যেহেতু ভাষাকে অলঙ্কৃত করা সেজন্যে আজকে যেমন— তেমনি তিন সহস্রাধিক বছর আগেও এর বিশিষ্ট স্থান ছিল।

মনীষী যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে (একাধারে ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ) উপমাকে 'নিপাত' হিসেবে ধ'রলেন। বহুবিধ অর্থে নিপতিত হয় (অর্থাৎ নানা অর্থ প্রকাশক) ব'লে কতকগুলো অব্যয়ের নাম 'নিপাত' এবং এই বহুবিধ অর্থের অন্যতম উপমা অর্থ। ("অথ নিপাতাঃ। উচ্চাবচে অর্থেষু নিপতন্তি। উপমার্থে অপি") এই নিরুক্তগ্রন্থেই যাস্ক মহামুনি গার্গ্য রচিত উপমার সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত ক'রেছেন তৃতীয় অধ্যায়ে, এর বিশদ পরিচয় দিতে "যদতত্তৎ সদৃশম্ ইতি"—অর্থাৎ যৎ (যে বস্তু) অতৎ (সে বস্তু নয়), (তথাপি) তৎ (তার—সেই বস্তুর) সদৃশম্ (মতন—ন্যায়)— যে বস্তু সে বস্তু নয়, তবু তার মতন। একটা উদাহরণ দিলে গার্গ্যের সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট হ'তে পারে— মুখ চাঁদ নয় তবু চাঁদের মতন দেখতে অর্থাৎ মুখের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এবং চাঁদের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এই সাধারণ মিল মুখের ও চাঁদের মধ্যে আছে—সেজন্যই মুখকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হ'য়েছে।

এছাড়া যাস্কমুনি ঋগ্‌বেদ থেকে সংগ্রহ করেছেন 'কর্ম্মোপমা' (ক্রিয়া যে উপমার সাধারণ ধর্ম) যৎ অব্যয়যুক্ত সিদ্ধোপমা (লোকপ্রসিদ্ধিই 'সিদ্ধোপমা' নামের কারণ) এবং (বর্ণ, রূপ ইত্যাদি উপমাজ্ঞাপক শব্দ যদি বহুব্রীহির উত্তরপদ হয়) রূপোপমা— (হিরণ্যবর্ণস্য ইব অস্য রূপম্—যাস্ক) হিরণ্যবর্ণের রূপের মতন রূপ যার (সে হিরণ্যবর্ণ রূপ, অগ্নি) এবং 'অথ লুপ্তোপমানি ইতি আচক্ষতে'—'আচক্ষতে' শব্দ থেকে বোঝা যায় যাস্কের পূর্বাচার্যদের মতে তুলনাবাচক শব্দের অনুপস্থিতিতে যেখানে অর্থ থেকে উপমা বোধ হয় সেখানে হয় লুপ্তোপমা। তাহলে লুপ্তোপমা শব্দটি যাস্কের সৃষ্ট নয়,

আর তাছাড়া মনীষী যাস্ক তাঁর গ্রন্থে গার্গ্য, শাকটায়ন, মৌদ্‌গল্য, বার্ষায়নি, কাৎথক্য, শাকপূনি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতের মত বহুস্থানে উদ্ধৃত ক'রেছেন। যাস্কের প্রায় পাঁচশ' বছর পরে 'বিশ্ববিশ্রুত ধ্বনিতত্ত্ববিদ' শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনি কেবল উপমা নয়, 'উপমিত', 'উপমান', এবং 'সামান্য' (সাধারণ বা সমোন্য ধর্ম) এ তিনটি অঙ্গে-রও বিশদ আলোচনা করেন তাঁর ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী'তে। আর এ খ্যাতিমান পাণিনি প্রসঙ্গে স্মর্তব্য দুটো নাম—কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কাত্যায়ন রচনা করেন 'বার্ত্তিক'-সূত্র, পাণিনি সূত্রের পরিপূরক হিসেবে আজও যে গ্রন্থ অদ্বিতীয়। এরও দু'শ বছর পরে পতঞ্জলি রচনা করেন অনুপম 'মহাভাষ্য' ('সবার্ত্তিক পাণিনি সূত্রের)।

পাণিনির ব্যাকরণে উপমা বিষয়ে বহুবিধ সূত্র দেখা যায়, তার মধ্যে "উপমানানি সামান্যবচনৈঃ" সামান্য বচনকে নিয়ে উপমান (কর্মধারয়) ঘনশ্যাম ঃ "উপমানাৎ আচারে" এবং "উপমানং শব্দার্থপ্রকৃতৌ-এব" ইত্যাদি। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি তাঁদের গ্রন্থে পাণিনির বিভিন্ন সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা এবং পরিপূরক বিশ্লেষণ সংযোজিত ক'রেছেন।

যাস্ক, পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি এঁরা সকলেই বৈয়াকরণ, কেউই আলঙ্কারিক নন। এবং একথা স্বীকার্য, ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের স্থান হলেও বৈয়াকরণের সৌন্দর্যবোধ প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তবুও নীরস ব্যাকরণের সূত্রে সংজ্ঞায় কিংবা ভাষার অন্তরঙ্গ-স্পন্দন আবিষ্কারে কোথাও কোথাও তাঁদের কাব্য-সৌন্দর্যবোধের চকিত দীপ্তি দুর্লভ নয়।

বৃহস্পতি বাক্ সুক্তের একটি ঋক্-এ যে অবিস্মরণীয় উপমা ব্যবহার ক'রেছেন, মনীষী যাস্ক-এ যার উল্লেখ পাই—বাক্ কেমন ক'রে আত্মপ্রকাশ করে বিশেষ (সহৃদয়-হৃদয় বা বিদ্বান) পাঠকের কাছে—"জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ" অর্থাৎ প্রসাধনময়ী বা সজ্জিতা কামনাময়ী দয়িতা যেমন আত্মপ্রকাশ করেন (আপন) দয়িতের কাছে, তেমনি।

সুতরাং ঋগ্‌বেদ হতে রামায়ণাদির মধ্য দিয়ে কাত্যায়নের 'বার্ত্তিক' কিংবা পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পর্যন্ত 'অলঙ্কার' উপমা এবং উপমার অঙ্গাদির (উপমিত, উপমান, সামান্য) ব্যবহার বা আলোচনা পেলাম কিন্তু পাওয়া গেল না কাব্যতত্ত্বের আওতাধীন পারিভাষিক অলঙ্কার এবং কাব্যালঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত উপমাকে।

'রূপক' শব্দটির ব্যবহার তৎকালীন ব্যাকরণে দেখা না গেলেও ব্রহ্মসূত্র, কঠোপনিষদ এবং ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে এর ব্যবহার দেখা যায়।

"....শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ" (ব্রহ্মসূত্র ১/৪/৪) । তবে এ কথা সত্যি যে, অলঙ্কার স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে হয়তো ব্যাকরণযুগেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, তা না হ'লে পতঞ্জলির প্রায় সমকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে এ কথা কিছুতেই লেখা সম্ভব ছিল না—